بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুরআনের চ্যালেঞ্জ

সকল সংস্কৃতিতে সাহিত্য এবং কবিতা মানুষের ভাব প্রকাশ ও সৃজনশীলতার অন্যতম প্রধান মাধ্যমে পরিগণিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব এমন একটা যুগ অতিবাহিত করেছে যখন সাহিত্য ও কবিতা গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান অর্জন করেছিল, যেমন বর্তমানে অর্জন করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

এমনকি অমুসলিম পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন যে, কুরআন এক অনন্য আরবি সাহিত্য এবং এটা পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্য। কুরআন মানব জাতিকে কুরআনের মত অনুরূপ গ্রন্থ তৈরি করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ -

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা সম্পর্কে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। এক আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার অবশ্যই তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।"

-সূরা বাক্বারা ঃ ২৩-২৪

কুরআনে নাযিলকৃত সুরাগুলোর মত যে কোন একটি সুরা তৈরি করার জন্য কুরআন চ্যালেঞ্জ করছে। ঠিক একই ধরণের চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ কুরআনে বারবার করা হয়েছে। সৌন্দর্যে, বাচনভঙ্গিতে, গভীরতায় এবং অর্থের দিক থেকে সমপর্যায়ের হওয়ার মত অন্য একটি সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি।

সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যিক ভাষায় যে ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীকে চ্যাপ্টা হিসেবে বর্ণনা করে, তা অবশ্য আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কখনই গ্রহণ করবে না। কারণ, আমরা এমন একটা যুগে বসবাস করি যেখানে মানবিক কারণ, যুক্তি এবং বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বেশিরভাগ লোকই কুরআনের অভূতপূর্ব চমৎকার ভাষার জন্য এটাকে আল্লাহর গ্রন্থের প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবে না। আল্লাহর নাযিলকৃত হবার দাবীদার কোন গ্রন্থকে অবশ্যই তার নিজস্ব কারণ ও যুক্তির উপর গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম পঙ্গু'। তাই চলুন কুরআন অধ্যয়ন করি এবং এটিকে জানতে বা বুঝতে খুঁটিয়ে দেখি যে, কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান কী সংগতিপূর্ণ নাকি সংঘাতপূর্ণ?

কুরআন বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নয় বরং 'সতর্ক করার জন্য বা পথ নির্দেশ করার জন্য নিদর্শন স্বরূপ এক গ্রন্থ'; উদাহরণস্বরূপ এর আয়াতসমূহের কথা বলা যেতে পারে। কুরআনে ছয় হাজারেরও বেশি নিদর্শনস্বরূপ আয়াত রয়েছে যার মধ্যে এক হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভূক্ত করে নাযিল হয়েছে।

আমরা সবাই জানি যে, অধিকাংশ সময় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। তাই শুধুমাত্র প্রমাণসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে আমি এ বইটিতে আলোচনা করেছি– যা প্রমাণহীন নিছক অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিহীন কল্পনা ও তত্ত্ব নয়।

অবতরণিকা

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পরক্ষণ থেকেই মানুষ সর্বদা প্রকৃতিকে, সৃষ্টির পরিকল্পনায় নিজেদের অবস্থানকে এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বুঝতে চেষ্টা করেছে। সত্যসন্ধানের এ প্রক্রিয়ায় বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সভ্যতার মাধ্যমে সুসংগঠিত ধর্ম মানবজীবনকে সুগঠিত করেছে, ইতিহাসের গতিকে নিরূপণ করেছে । ইতোমধ্যে কিছু ধর্ম লিখিত পুস্তকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং তাদের অনুসারীরাও সেগুলোকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে দাবি করছে, অন্যান্য ধর্মগুলো শুধুমাত্র মানবীয় অভিজ্ঞতার ফসলে রূপ নিয়েছে।

ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের মূল হচ্ছে কুরআন। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এছাড়া মুসলমানেরা কুরআনকে মানবজাতির জন্য পথনির্দেশক হিসেবে মানে। কুরআনের বাণীকে যেহেতু সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করা হয়, সেহেতু এটি সকল যুগের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কুরআন কী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে?

আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিরিখে আল্লাহর বাণী কুরআনের ভিত্তিতে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা তুলে ধরব।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন 'অলৌকিকতা' অথবা যা অলৌকিক হিসেবে মনে করা হতো, তা মানবীয় কারণ ও যুক্তির উপর অগ্রগণ্য ছিল। অলৌকিকতার সাধারণ সংজ্ঞা হল, যা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত এবং সেজন্য মানুষের কাছে এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

তবে কোন কিছুকে 'অলৌকিক' হিসেবে নেয়ার আগে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। মুম্বাই থেকে প্রকাশিত 'The Times of India' ১৯৯৩ সালে প্রকাশ করেছিল যে, 'বাবা পাইলট ' নামে এক সাধু একটানা তিনদিন- তিনরাত ট্যাংকের ভিতরে পানির নিচে থাকার দাবী জানায়। কিন্তু সাংবাদিকেরা ঐ ট্যাংকটির তলদেশ পরীক্ষা করতে চাইলে সে তাদেরকে অনুমতি দেয়নি। তখন সে খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করে, "যে মা সন্তান প্রসব করে তার পেট পরীক্ষা করা যায় কিভাবে?" ঐ সাধুটির অবশ্যই লুকানোর মত কোন কিছু ছিল। মুলত সে নিজেকে জনপ্রিয় করতে প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছিল। সামান্যতম যৌক্তিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন আধুনিক ব্যক্তিও এ ধরণের অলৌকিকতাকে গ্রহণ করবে না। যদি এধরণের মিথ্যা অলৌকিকতা সৃষ্টিকর্তার পরীক্ষা হয়, তাহলে আমাদেরকে ঐসব বিশ্ববিখ্যাত যাদুকরদেরকে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত অনুসারী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে, যারা তাদের অতি সাধারণ যাদুকরী কৌশল ও মিথ্যাচারের রূপকার বলে পরিচিত।

কোন গ্রন্থ প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বা ওহী হবার দাবীদার হলে তা অবশ্যই অলৌকিক হবে। এ ধরণের দাবী যে কোন সময়ে সে যুগের মাপকাঠিতে সহজেই পরীক্ষনীয় হওয়া উচিত। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কুরআন মানবতার

প্রতি আল্লাহর দয়ায় নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ এবং শ্রেষ্ঠ অলৌকিকতা। তাহলে এই ধর্মীয় বিশ্বাসের যথার্থতা কতটুকু, আসুন তা জানা যাক।

পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার

পূর্বকালে মানুষ বিশ্বাস করতো পৃথিবী চ্যাপ্টা। পৃথিবীর কিনারা থেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে শত শত বছর ধরে মানুষ বেশি দূর পর্যন্ত ভ্রমন করতো না। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেইক প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৫৯৭ সালে পৃথিবীর চতুর্দিকে নৌ-ভ্রমণের পর প্রমাণ করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

দিন ও রাত্রির পরিবর্তন সম্পর্কে কুরআনের আয়াতটিকে বিবেচনা করা যাক–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ -

"তুমি কী দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন, এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন?'

–সূরা লুকমানঃ ২৯

এখানে বলা হচ্ছে, রাত্রি ধীরে ধীরে ক্রমশ দিনে পরিবর্তিত হয় এবং অনুরূপভাবে দিনও ধীরে ধীরে ক্রমশ রাত্রিতে পরিবর্তিত হয়। শুধুমাত্র পৃথিবী গোলাকার বলেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে রাত্রি থেকে দিনে ও দিন থেকে রাত্রিতে একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে যেত।

অগভীর নক্ষত্র হচ্ছে গ্যাস ও ধূলিকণার ধূম্র ব্যাস প্রায় ৬০ আলোক বর্ষ। এটির (নক্ষত্রের) স্তুপের মধ্যে তুলনামূলক পূর্বে গঠিত উত্তপ্ত নক্ষত্রের অতি বেগুনী রশ্মির দ্বারা এটি সক্রিয় হয়। (Horizons, Exploring the Universe, Seeds, plates9, from Association of Universities for Reasearch in Astronomy, Inc.)

জার্মানীর মেইনযে অবস্থিত জোহান্স গাটনবার্গ ইউনিভার্সিটির ইন্সটিটিউট অভ্ জিওসাইয়ান্সিস- এর ভূতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ড. আলফ্রেড ক্রোনার বিশ্বের প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ। তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ যেখানে যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিল... সে সম্পর্কে ভাবলে আমার মনে হয়, তাঁর পক্ষে বিশ্বের উৎপত্তির মত বিষয় সম্পর্কে জানা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল; কারণ খুবই জটিল ও অগ্রগামী পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা মাত্র গত কয়েক বছরের মধ্যে এ বিষয়গুলো জানতে পেরেছে।' এছাড়া তিনি আরো বলেন, 'আমি মনে করি, ১৪০০ বছর পূর্বের কোন ব্যক্তি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্পর্কে কোনকিছুই জানত না, সে নিজের মন থেকে এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করতে পারত না, যেমন- একই উৎস থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি ইত্যাদি। (এই বর্ণনার জন্য তথ্যসূত্র হচ্ছে 'এটাই সত্য' নামক এক ভিডিও টেইপ।)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ - يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ ۔

"তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" –সূরা যুমারঃ ৫

এখানে আরবী শব্দ "كُوِّر" অর্থ 'আচ্ছাদিত করা' বা 'কোন জিনিসকে প্যাঁচানো'– যেমনি মাথার চতুর্দিকে পাগড়ী পেঁচানো হয়। দিন ও রাত্রির 'আচ্ছাদিত করা' বা 'কুণ্ডলী পাকানোর' ঘটনাটি শুধুমাত্র তখনই ঘটতে পারে যদি পৃথিবীটা গোলাকার হয়।

পৃথিবীটা বলের মত পুরোপুরি গোলাকার নয় বরং ভূ-গোলকের মত, এটি মেরুর দিকে চ্যাপ্টা অর্থাৎ মেরুকেন্দ্রিক চ্যাপ্টা। নিচের আয়াতটি পৃথিবীর আকারের একটা বর্ণনা ধারণ করে–

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحٰهَا ۔

"এবং আল্লাহ্ পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতি করে তৈরি করেছেন।" –সূরা আন-নাযিআতঃ ৩০

এখানে ডিমের জন্য ব্যবহৃত আরবী শব্দ হচ্ছে دَحٰهَا (দাহাহা)১, যার অর্থ একটি উটপাখির ডিম। একটি উটপাখির ডিমের আকৃতি হচ্ছে পৃথিবীর ভূ-গোলকীয় আকৃতি সদৃশ। এভাবেই কুরআন পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে বর্ণনা করে, যদিও কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ে পৃথিবী চ্যাপ্টা হবার ধারনাটাই ব্যাপকভাবে সর্বত্র প্রচলিত ছিল।

চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো

আদি সভ্যতাগুলো বিশ্বাস করতো যে, চাঁদ তাঁর নিজস্ব আলো দেয়। বিজ্ঞান আমাদেরকে জানায় চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো। অবশ্য ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআন নিচের আয়াতটিতে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيْرًا –

"কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র।"

–সূরা আল-ফুরক্বান ঃ ৬১

কুরআনে সূর্যের জন্য ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে شَمْس (শামস)। আবার سِرَاجًا (সিরাজ) হিসেবেও উল্লেখ করা হয় যার অর্থ মশাল, 'ওয়াহহাজ' হিসেবে যার অর্থ 'প্রজ্জ্বলিত বাতি' অথবা 'দিয়া' হিসেবে যার অর্থ উজ্জ্বল জ্যোতি। তিনটি বর্ণনার সবগুলোই সূর্যের জন্য যথোপযুক্ত, কারণ সূর্য অন্তর্দাহের মাধ্যমে প্রচণ্ড তাপ ও আলো উৎপন্ন করে (Internal combustion হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় কোন কিছুর অভ্যন্তরে গ্যাস বা বাষ্পের বিস্ফোরণের দরুন শক্তি উৎপন্ন হয়)।

قمر (ক্বামার) হচ্ছে চাঁদের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত আরবী শব্দ এবং এটি কুরআনে مُنِيْر (মুনীর) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যা প্রতিফলিত আলোদানকারী একটি বস্তু। তাছাড়া, চাঁদ হচ্ছে একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু, যা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে, চাঁদের প্রকৃতিগত এ বৈশিষ্ট্যের সাথে কুরআনে বর্ণিত বর্ণনা যথাযথ মিলে যায়। কুরআনে শুধুমাত্র সূর্যকে سِرَاجٌ (সিরাজ), وَهَّاجًا (ওয়াহহাজ) বা ضِيَاء (দিয়া) হিসেবে এবং চাঁদকে نُور (নূর) বা مُنِيْر (মুনীর) হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং কুরআনে চাঁদের আলো ও সূর্যের আলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্যের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নিচের আয়াতগুলো সূর্যের ও চাঁদের আলোর প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا –

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে।" –সূরা ইউনূসঃ ৫

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا – وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا –

"তোমরা কী লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে, এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।" – সূরা নুহ ঃ ১৫-১৬

সূর্যের আলো এবং চাঁদের আলোর প্রকৃতির পার্থক্যের ব্যাপারে কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান এভাবেই প্রকৃত সামঞ্জস্যতা বিধান করে।

সূর্য চক্রাকারে আবর্তিত হয়

দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করতো যে, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে সম্পূর্ণ স্থির এবং সূর্যসহ সবকিছু পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগ থেকে মহাবিশ্বের এ ভূকেন্দ্রিক ধারণা পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত সত্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। ১৫১২ সালে নিকোলাস কোপারনিকাস তার 'সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহসংক্রান্ত গতিতত্ত্ব' এতে বলেন যে, 'সূর্য তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়ন গ্রহগুলোর সৌরজগতের কেন্দ্রে গতিহীন'।

১৬০৯ খ্রিঃ জার্মান বিজ্ঞানী ইউহান্নাস কেপলার 'Astronomia Nova' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এ বইটিতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র গ্রহগুলোই সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না, বরং গ্রহগুলো তাদের নিজস্ব অক্ষে অসম গতিতে আবর্তন করে। এ জ্ঞানের ফলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে রাত্রি ও দিনের অনুক্রমসহ সৌরজগতের অনেক কাজপদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

এসব আবিষ্কারের পরেও বিশ্বাস করা হতো যে, সূর্য স্থির এবং এটি পৃথিবীর মত নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তন করে না। আমার মনে পড়ে যখন আমি স্কুলে পড়ি, তখন ভূগোল বই পড়ে এই ভুল ধারণাটি জেনেছি।

নিচের আয়াতটিকে মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করিঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ –

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।"

–সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৩

উপরের আয়াতে ব্যবহৃত আরবী শব্দ হচ্ছে يَسْبَحُوْنَ (ইয়াছবাহুন)। এই শব্দটি سَبَحَ (সাবাহা) শব্দ থেকে এসেছে। এ শব্দটি যেকোনো চলমান বস্তু থেকে উদ্ভূত গতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি যদি মাটির উপরে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাহলে এর অর্থ হবে না যে, সে গড়াচ্ছে বরং এটি তার হাটা বা দৌড়ানোর দিকে ইঙ্গিত করবে। আবার শব্দটি যদি পানিতে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাহলে এর অর্থ হবে না যে, সে ভাসছে বরং এটি তার সাঁতরানোর দিকে ইঙ্গিত করবে।

একইভাবে, যদি আপনি يَسْبَحُوْنَ (ইয়াছবাহুন) শব্দটি কোন মহাকাশের কোন বস্তু, যেমন, সূর্যের জন্য ব্যবহার করেন, তাহলে এটা শুধুমাত্র মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে উড়ার অর্থই বহন করে না, বরং এর অর্থ এটি এমনভাবে আবর্তিত হচ্ছে যে, এটি মহাশূন্যের ভেতর দিয়েও যাচ্ছে।

অনেক স্কুলের পাঠ্যক্রমে এখন এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, সূর্য তার কক্ষপথে আবর্তন করে। নিজের কক্ষপথে সূর্যের আবর্তন একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে, যা সূর্যের ছবিটিকে একটি টেবিলের উপর প্রতিফলিত করে। এবং কেউ বিচারবুদ্ধিহীন না হলে সূর্যের ছবিটি পরীক্ষা করতে পারে। লক্ষণীয় যে, সূর্যের নিজস্ব অবস্থান অঞ্চল আছে যা প্রতি ২৫ দিনে একটি বৃত্তাকারে আবর্তন করে, অর্থাৎ নিজের কক্ষপথের চতুর্দিকে ঘুরতে সূর্যের প্রায় ২৫ দিন সময় লাগে।

সূর্য প্রায় ২৪০ কি. মি./সে গতিতে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে এবং আমাদের ছায়াপথের (মহাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকাসৃষ্ট সুদীর্ঘ জ্যোতির্ময় বেষ্টনী) কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটি পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর লাগে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ - وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

"সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের।

প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে প্রদক্ষিন করে।" –সূরা ইয়াসিনঃ ৪০

এ আয়াতটি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্দেশ করে: যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের পৃথক পৃথক কক্ষপথের অস্তিত্ব এবং এগুলোর নিজস্ব গতিতে মহাশূন্যে ভ্রমণ।

সৌরজগতকে নিয়ে সূর্য যে নির্দিষ্ট লক্ষে চলছে, তা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্তৃক সুনিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত সত্য। এটিকে 'সৌর শৃঙ্গ' বলা হয়। আসলে সৌরজগত মহাশূন্যে যে দিকে ধাবিত হয়, সে দিকটির অবস্থান যথার্থ ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আসলে সৌরজগত হারকিউলিসের কক্ষপথে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে যাচ্ছে যার অবস্থান বর্তমানে খুব জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরতে যে সময় লাগে, একই সময়ে চন্দ্র তার নিজস্ব কক্ষপথের চতুর্দিকে একবার চক্রাকারে আবর্তন করে। চন্দ্রের একটি পূর্ন চক্র সম্পন্ন করতে সাড়ে ২৯ দিন সময় লাগে।

কুরআনের আয়াত সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতায় কেউ বিস্মিত না হয়ে পারেন না। আমাদের কী প্রশ্নটির ব্যাপারে ভাবা উচিত নয় "কুরআনের জ্ঞানের উৎস কী?"

নির্দিষ্ট সময় পরে সূর্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে

সূর্যের আলো হচ্ছে এর পৃষ্ঠের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল যা পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে চলবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এক সময়ে এর বিলুপ্তি ঘটবে যখন সূর্য ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য সকল প্রাণীর অস্তিত্বের বিলুপ্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিস্প্রভ হয়ে যাবে। সূর্যের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

"সূর্য আবর্তন করে, তার নির্দিষ্ট অবস্থানে। এটা, পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।" –সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮

এখানে ব্যবহৃত আরবী শব্দ হচ্ছে, مُسْتَقَرّ (মুসতাকার), যার অর্থ 'একটি নির্দিষ্ট স্থান' বা 'একটি নির্দিষ্ট সময়'। এভাবে কুরআন বলে যে, সূর্য একটা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে আবর্তন করছে যা পূর্বনির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে এর অর্থ এই যে, এটির বিলপ্তি ঘটবে অথবা নিস্প্রভ হয়ে যাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিশ্ব সৃষ্টিঃ 'বিগ ব্যাঙ'

বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত যে ব্যাখ্যাটি ব্যাপকভাবে গ্রহণকৃত একটি বিস্ময়কর বিষয়, তা 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্ব হিসেবে সুপরিচিত। যুগযুগ ধরে নভোচারী ও জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক সংগৃহীত পর্যক্ষেণ ও পরীক্ষণমূলক তথ্যের মাধ্যমে এ ধারণাটি সমর্থিত হয়েছে। 'বিগ ব্যাঙ' (মহা বিস্ফোরণ) তত্ত্ব মতে আদিতে পুরো বিশ্বটি একটা বড় পিণ্ড (রাতের আকাশে আলোর অস্পষ্ট ছোপের মতো দেখতে অতি দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ আদি নীহারিকা) আকারে

ছিল। তারপর সেখানে একটা মহা বিস্ফোরণ ঘটে (দ্বিতীয়ত পর্যায়ের বিচ্ছিন্নতা) যার ফলে ছায়াপথ (মহাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকাসৃষ্ট সুদীর্ঘ জ্যোতির্ময় বেষ্টনী বা (Galaxy) তৈরি হয়। এগুলো পরবর্তীতে গ্রহ, তারা, সূর্য, চাঁদ, ইত্যাদিতে পরিণত হয়। বিশ্বের উৎপত্তি ছিল এক অনন্য ঘটনা এবং অলৌকিক ভাবে ইহা ঘটার সম্ভাবনা নেই।বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে কুরআনে আয়াত রয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ

"কাফেররা কী দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল (সৃষ্টির একটা অংশ হিসেবে) অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম।" (আম্বিয়া ঃ ৩০)

কুরআনের আয়াত ও 'বিগ ব্যাঙ' এর মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্যতা সত্যিই কিছুতেই উপক্ষেণীয় নয়। ১৪০০ বছর পূর্বে আরবের মরুভূমিতে নাযিলকৃত একটা গ্রন্থ কীভাবে এই জ্ঞানগর্ভ বৈজ্ঞানিক সত্য ধারণ করতে পারে?

ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে প্রাথমিক গ্যাস

বিজ্ঞানীরা একমত যে, বিশ্বে ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে আকাশ সম্পর্কীয় বস্তুগুলি প্রাথমিকভাবে গ্যাস জাতীয় পদার্থের আকারে ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ছায়াপথ তৈরির পূর্বে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পদার্থ অথবা মেঘ বিদ্যমান ছিল। আকাশ সম্পর্কীয় আদি পদার্থ বর্ণনা করতে 'ধোঁয়া' শব্দটি গ্যাসের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত 'দুখা-ন' শব্দটি দ্বারা বিশ্বের এই অবস্থাকেই বুঝায় যার অর্থ ধোঁয়া।

আল্লাহ তা'যালা কোরআনে বলেন–

"তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ, তারপর তিনি তাকে এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারপর তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।" –সূরা ফুচ্ছিলাত ঃ ১১

তাছাড়া 'বিগ ব্যাঙ' এর স্বাভাবিক পরিণতি হল এই ঘটনা এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বে এটি কারও কাছেই পরিচিত ছিল না। তাহলে, তখন এই জ্ঞানের উৎস কী হতে পারতো?

আন্তর্নাক্ষত্রিক বস্তুর অস্তিত্ব

পূর্বে মহাকাশের জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতির সুসংগঠিত ধারণার বাইরের স্থানকে শূন্য মনে করা হত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে এ আন্তর্নাক্ষত্রিক মহাশূন্যে বস্তুর সেতুর [২] অস্তিত্বের সন্ধান পায়। বস্তুর এ সেতুগুলোকে

১ এ বিষয়টি অন্য একটি আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এভাবে, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ـ

" যখন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। –সূরা তাকভীরঃ ১

২ আদি-নীহারিকার অন্তঃস্থিত বস্তু সমূহের ঘনীভূত হওয়া এবং পরিণতিতে সেসব বিভক্ত হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়াটাই ছিল বিশ্বসৃষ্টির মৌল প্রক্রিয়ার সূচনা পর্ব। এসব খণ্ডই পরে ছায়াপথের আদি পিণ্ডে পরিণত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ছায়াপথের এই খণ্ডগুলো আবারও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মহাকাশের অসংখ্য নক্ষত্র সৃষ্টি করে। একই প্রক্রিয়ায় সেসব নক্ষত্র টুকরা টুকরা হয়ে পরবর্তী বস্তু অর্থাৎ গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রতিবারের এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মূল বস্তুতে কিছু না কিছু অবশিষ্টাংশ থাকে, সেগুলোকে বলা হায় 'ধ্বংসাবশেষ'। আর এগুলোর সঠিক বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে, 'আন্তর্নাক্ষত্রিক ছায়াপথ বস্তু'। এসব আন্তর্নাক্ষত্রিক বস্তু বিভিন্নভাবে পরিচিতি পায়, যেমন কিছু 'অবশিষ্ট'

নীহারিকা রয়েছে, যেসব নীহারিকার মধ্যে অন্যান্ন নক্ষত্র থেকে প্রাপ্ত আলোর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মহাকাশ পদার্থবিজ্ঞান বিশারদদের ভাষায়, এসব নীহারিকা সম্ভবত 'ধূলি' অথবা 'ধোঁয়ার' দ্বারা পরিগঠিত। এছাড়াও এমন নীহারিকা রয়েছে, যেসব নীহারিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম ঘনীভূত। এসব নীহারিকায় আন্তর্নাক্ষত্রিক এমন সব বস্তু যা আকারে তেমন বৃহৎ নয়। তবুও তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফটোম্যাট্রিক গণনায় তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এক প্রক্রিয়ায় এ ধরণের বস্তুর দ্বারা বিভিন্ন ছায়াপথের মধ্যে যে 'সেতু' গঠিত রয়েছে, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এসব বস্তু তথা গ্যাস খুবই তরলিত আকারে বিদ্যমান। আমরা জানি যে, একটি ছায়াপথ থেকে আরেকটি।

ছায়াপথের দুরত্বকে প্লাজমা বলা হয়, যা সমান সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট সম্পূর্ণ আয়নিত গ্যাস দিয়ে গঠিত। প্লাজমাকে অনেক সময় বস্তুর চতুর্থ অবস্থাও বলা হয় (অন্য পরিচিত তিনটি অবস্থা হচ্ছে-কঠিন, তরল এবং গ্যাস)। কুরআনে এই আন্তর্নাক্ষত্রিক বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে বলেছে

اَلَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا -

"তিনিই সে সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ, ও জমিন এবং যা এর মধ্যে আছে তা।" –সূরা আল-ফুরক্বান ঃ ৫৯

তারপরও যদি কেউ বলে যে আন্তর্নাক্ষত্রিক ছায়াপথবর্তী বস্তুর উপস্থিতি ১৪০০ বছর আগেই জানা গিয়েছিল, তাহলে তা সবার জন্য হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়!

সম্প্রসারণশীল বিশ্ব

১৯৫২ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'এডউইন হাবল' পর্যবেক্ষণমূলক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, সকল ছায়াপথ একে অপর থেকে অপসৃত হচ্ছে বা দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য। কুরআন বিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে একই কথা বলেঃ

وَالسَّمَآءَ بَنَیْنٰهَا بِاَیْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ـ

"আমি নিজ হাত দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সম্প্রসারণকারী।" –সূরা যারিয়াত ঃ ৪৭

ছায়াপথের ব্যবধান বিরাট। সেই নিরিখে, এসব তরলিত গ্যাস বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে। তাছাড়া এসব তরলিত গ্যাস ক্রমান্বয়ে গ্যাসপিণ্ডে পরিণত হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘনত্ব কম হলেও এসব গ্যাসপিণ্ড ছায়াপথ সমূহে অবস্থিত গ্যাসপিণ্ডের চেয়ে বিশাল হওয়াই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানী এ. বয়চট বলেন, আন্তঃছায়াপথ সংযোগকারী এসব গ্যাসপিণ্ডের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা, 'বিশ্বসৃষ্টির বিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে ধারণা বর্তমানে চালু আছে, এসব সংযোগকারী গ্যাসপিণ্ড সে ধারণা অনেকাংশেই বদলে দিতে পারে।' (ড. মরিস বুকাইলি, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, ইন্টারনেট সংস্করণ, পৃথিবী ও বিশ্বের সৃষ্টি অধ্যায়/

আরবী শব্দ (মূছিউন)- এর সঠিক অনুবাদ করা হয় 'সম্প্রসারণকারী' হিসেবে, এবং বিশ্বের সম্প্রসারণশীল বিশালতার সৃষ্টির দিকেই এটি ইঙ্গিত করে।

অন্যতম খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (A Brief History of Time) নামক গ্রন্থে বলেন, "মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে", এ আবিষ্কারটি বিংশ শতাব্দির অন্যতম বুদ্ধিবৃত্তিক

বিপ্লব।" কিন্তু কুরআন এমন সময় বিশ্বের সম্প্রসারিত হবার কথা বলেছে, যখন মানুষ সামান্য টেলিস্কোপও আবিষ্কার করতে পারেনি।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, কুরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সত্যের উপস্থিতি বিস্মিত হওয়ার মত কিছু না, কারণ আরবজাতি জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রসর ছিল। জ্যোতির্বিদ্যায় আরবদের অগ্রসরতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে তারা সঠিক। তবুও তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, আরবজাতি জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার কয়েক শতাব্দি পূর্বেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। তদুপরি, আরবরা তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতার স্বর্ণ শিখরে অবস্থানকালে– বিগ ব্যাঙ-এর কারণে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ছাড়াও উপরে উল্লেখিত অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। কুরআনে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ তাই আরবদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগতির ফল নয়। বরং বিপরীত মতটাই সত্য যে, কুরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয় জ্ঞানালোচনা বিদ্যমান রয়েছে বলেই তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগতি সাধন করেছিল।

ভূ-বিজ্ঞান

পানিচক্র ঃ ১৫৮০ সালে বের্নার্ড প্যালিসি সর্বপ্রথম পানিচক্রের বর্তমান ধারণা প্রবর্তন করেন। ১. সমুদ্র থেকে পানির বাষ্পিভূত হওয়া এবং পরবর্তীতে তা ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি তিনি ব্যাখ্যা করেন। মেঘমালা ভূখণ্ডের উপরে সমুদ্র দূরবর্তী স্থানে উঠে গিয়ে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃষ্টি আকারে নীচে নেমে আসে। এই বৃষ্টির পানি বা জলাশয় ও নদীনালার মাধ্যমে পুনরায় সাগরে ফিরে আসে, বিরামহীনভাবে এই প্রক্রিয়াটির বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে মিলেটুসের থেলেস এ মতবাদ পোষণ করতেন যে, সমুদ্রের উপরিভাগের ছড়ানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাকে বাতাস ধারণ করে উপরে তুলে নেয় এবং সমুদ্র দূরবর্তী স্থানে নিয়ে তা বৃষ্টিরূপে ছড়িয়ে দেয়।

প্রাচীনকালের মানুষেরা ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস সম্পর্কে জানত না। তারা ভাবত যে, বাতাসের তোড়ে সমুদ্রের পানি দ্রুতগতিতে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে এসে পতিত হয়। তারা আরও বিশ্বাস করতো যে, পানি একটি গোপন পথে বা অতল গহ্বরের মাধ্যমে ফিরে আসে। আর এপথ সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত এবং এটিকে প্লেটোর যুগ থেকে 'টারটারুস' বলা হয়েছে। ২ এমনকি ১৮০০ শতাব্দির বিখ্যাত চিন্তাবিদ ডেসকার্টিজও একই মত দিতেন। উনবিংশ শতাব্দিতে (১৮৭৭ সাল অবদি) এরিস্টটলের তত্ত্ব সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। এ তত্ত্ব অনুসারে, ঠাণ্ডা পর্বতের গভীর গহ্বরে পানি ঘনীভূত হয়ে সেখানে এক গভীর ভূগর্ভস্থ হ্রদ সৃষ্টি হয় যা ঝর্ণা হয়ে প্রবাহিত হয়। বর্তমানে আমরা জানি যে, বৃষ্টির পানি মাটির ফাটল দিয়ে চুয়ে পড়াই এজন্য দায়ী।

১. এই মতবাদটি ১৭ শতাব্দীতে এসে ম্যারিয়াট এবং পি. প্যারল্ট-এর সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

২. মূলত, প্লেটোর মত খ্যাতিমান দার্শনিকও এক অভিমত পোষণ করতেন।

নিম্নে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলোতে পানিচক্র সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"তুমি কী দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমিনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদদ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন।" -সূরা যুমারঃ ২১

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদদ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" –সূরা আররূম ঃ ২৪

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ ق فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ -

"আমি আকাশ থেকে পরিমাণ মত পানি বর্ষণ করে থাকি, অতঃপর আমি জমীনে সংরক্ষণ করি এবং তা অপসারণও করতে সক্ষম।" –সূরা মু'মিনূনঃ ১৮

১৪০০ বছর পূর্বে এমন কোন গ্রন্থ ছিল না যা পানিচক্র সম্পর্কে এমন নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারে।

বাতাস মেঘকে পূর্ণ করে

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ -

"আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই।" –সূরা হিজর ঃ ২২

এখানে ব্যবহৃত আরবী শব্দ হচ্ছে, لَوَاقِحَ (লাওয়াক্বিহ) যা لَقِحَ (লাকিহ) শব্দের বহুবচন এবং এর উৎপত্তি لقح 'লাক্বাহ' শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে পূর্ণ করা, গর্ভবতী করা অথবা উর্বর করা। এখানে 'পূর্ণ' করার অর্থ হচ্ছে যে, বাতাস মেঘমালাকে একসাথে ধাক্কা দিয়ে ঘনীভবনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ফলে আকাশে বিদ্যুত চমকায় এবং বৃষ্টির সূচনা হয়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ -

"তুমি কী দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি কী দেখ যে, তাহতে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।" – সূরা আন-নূর ৪৩

"তিনিই আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্যে থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান; তখন তারা আনন্দিত হয়।" – সূরার নাম ৩০ঃ৪৮

"শপথ চক্রশীল ' আকাশের" –সূরা ত্বারিক্ব ঃ ১১

পানি বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যের আঙ্গিকে কুরআনের বর্ণনাগুলো সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল এবং সঠিক। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পানি চক্রের বর্ণনা রয়েছে, যেমন–

"তিনিই (আল্লাহ) বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত ভূখণ্ডের দিকে পাঠিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করি যাতে তোমরা চিন্তা কর।" –সূরা আল-আ'রাফ ৫৭

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফিত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে।" -সূরা রা'দ ১৭

"তিনিই রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি। তদদ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করার জন্যে এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে।" –সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪৮-৪৯

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালাকে পরিচালিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি,

অতঃপর তদদ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সজীব করে দেই।

এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান।" আমি পৃথিবীতে প্রবাহিত করি নির্ঝরিনী।"

"আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" –সূরা আল-জাসিয়া ঃ ৫

"আমি কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদদ্বারা বাগান ও শস্য উৎপন্ন করি, সেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়। এবং লম্বমান খর্জুর, বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে জীবন দান করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।" -সূরা ক্বাফ ঃ ৯-১১

"তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কী? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?'

–সূরা আল-ওয়াক্বিয়া ৬৮-৭০

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান

পাহাড়-পর্বতগুলো পেরেক সদৃশ

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানে 'ভাঁজ করার' বিষয়টি একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত সত্য। পৃথিবীর যে কঠিন পৃষ্ঠে (rust) আমরা বাস করি তা শক্ত খোলের মত, অন্যদিকে পৃথিবীর অভ্যন্তর উত্তপ্ত ও তরল, ফলে যেকোনো প্রাণীর জন্য তা বসবাসের অনুপোযোগী। তাছাড়া এটাও প্রমাণীত যে, পাহাড়-পর্বতের স্থায়িত্ব ভাঁজ করার মত বিস্ময়কর ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ নড়বড়ে অবস্থা থেকে পরিত্রাণের মাধ্যমে পাহাড়-পর্বতের ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল এ ভাঁজগুলোর কাজ। ভূ-তত্ত্ববিদদের মতে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩,৭৫০ মাইল এবং যে ভূপৃষ্ঠে আমরা বাস করি তার বিস্তার এক মাইল থেকে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত। যেহেতু পৃষ্ঠটির বিস্তার পাতলা তাই আন্দোলিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পাহাড়-পর্বত পেরেকের মত পৃথিবীপৃষ্ঠকে ধারণ করার মাধ্যমে স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে।

কুরআনের আয়াতে হুবহু একই বর্ণনা রয়েছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا -

"আমি কী ভূমিকে বিছানা করিনি, এবং পর্বতমালাকে পেরেক?" –সূরা নাবা ৬-৭

এখানে ব্যবহৃত আরবী শব্দ اَوْتَادًا (আওতাদ)-এর অর্থ হচ্ছে পেরেক (যা দড়ি বা রজ্জুকে ভূমির সঙ্গে নির্দিষ্ট করে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়); এগুলো ভূতাত্ত্বিক ভাঁজের গভীর ভিত্তি যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। 'Earth' হচ্ছে সারাবিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিষয়ে ব্যবহৃত প্রাথমিক রেফরান্স বই। এই বইয়ের অন্যতম লেখক ফ্রাঙ্ক প্রেস যিনি ১২ বছর যাবত আমেরিকার Academy of Sciences'- এর প্রেসিডেন্ট এবং সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। এই বইয়ে তিনি বর্ণনা দেন যে, পাহাড়-পর্বতসমূহ পেরেকাকৃতি এবং এগুলো অবিভক্ত বস্তুর এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র যার মূল ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে নীচ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিস্তৃত। ড. প্রেসের মতে, পৃথিবীর কঠিন উপরিতলকে (crust) সুস্থিত অবস্থায় রাখতে পাহাড়-পর্বতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পৃথিবীকে কাঁপা থেকে রক্ষা করতে পাহাড়-পর্বতের ভূমিকার কথা কুরআনও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে ঃ

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ -

"আমি পৃথিবীতে ভারি বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে।" –সূরা আম্বিয়া ঃ ৩১
কুরআনে বর্ণনাসমূহ আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্তের সাথে নির্ভুলভাবে ঐক্যমত পোষণ করে।

সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্র প্রযুক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান

মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানির মধ্যেকার প্রতিবন্ধক

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ -

"তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন, উভয়ের মাঝখানে রয়েছে অন্তরাল, যা তারা কখনো অতিক্রম করতে পারে না।"সূরা আর-রাহমানঃ ১৯-২০

আরবী ভাষায় بَرْزَخٌ (বারযাখ) শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'একটি প্রতিবন্ধক' বা 'বিভাজন'। এই বিভাজন কোন শারীরিক বিভাজন নয়। আরবী শব্দ مَرَجَ(মারজা)-এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে যে-তারা উভয়ই একত্রে মিশে একাকার হয়ে যায়'। প্রথম যুগের কুরআনের তাফসীরকারকরা দুরকমের পানির দুইটি বিপরীত অর্থের ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ ছিলেন; উদাহরণস্বরূপ- তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও তারা একত্রে মিশে একাকার হয়ে যায় অথচ একই সময়ে উভয়ের মাঝে রয়েছে প্রতিবন্ধক। বর্তমানে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, দুটি ভিন্ন সমুদ্র একত্রে মিলিত হলে সেখানে উভয়ের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক থাকে। এই প্রতিবন্ধক দুটি সমুদ্রকে বিভক্ত করে, ফলে প্রত্যেক সমুদ্রের নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং ঘনত্ব বজায় থাকে। [১]সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্র প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করার এখনই তুলনামূলক সুবর্ণ সুযোগ। দুটি সমুদ্রের মাঝে অদৃশ্য ঢালু পানির প্রতিবন্ধক রয়েছে যার মধ্য দিয়ে এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে।

কিন্তু যখন এক সমুদ্র থেকে পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন সে সমুদ্রটি তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং অন্য সমুদ্রের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। এভাবে এই প্রতিবন্ধকটি দু'ধরণের পানির মধ্যে পরিবর্তনমূলক একীভূতকারী বন্ধনী হিসেবে কাজ করে।

এই বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا

"তিনিই দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন।" –সূরা আন-নামালঃ ৬১

এই প্রতিবন্ধক জিব্রাল্টারে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনস্থলসহ আরও কয়েক জায়গায় দেখা যায়। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ পয়েন্টে ও কেইপ পেনিনসুলায় একটি সাদা প্রতিবন্ধক পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে, যেখানে আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

কিন্তু কুরআন যখন মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে বিভক্তকারীর সম্পর্কে কথা বলে, তখন ঐ প্রতিবন্ধকের সাথে একটি নিবৃত্তিকর বিভাজনের বিদ্যমানতাও বলে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا -

"তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল" –সূরা আল-ফুরক্বান ঃ ৫৩

আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, নদীর মোহনায় যেখানে স্বাদু (মিঠা) পানি ও লবণাক্ত পানি মিলিত হয়, সে অবস্থাটি যেখানে দুটি লবণাক্ত পানির সমুদ্র মিলিত হয় তা থেকে কিছুটা ভিন্ন হয়। নদীর মোহনায় যা মিঠা পানিকে লবনাক্ত পানি থেকে পৃথক করে তা হচ্ছে দুই ধরণের পানিকে বিচ্ছিন্নভাবে ঘনত্ব পৃথককারী একটি স্থান। এ বিভাজন স্থানে এক প্রকার লবণাক্ততা আছে যা মিঠা ও লবণাক্ত উভয় থেকেই ভিন্ন।

মিশরের নীলনদ যেখানে ভূমধ্যসাগরের সাথে মিলিত হয় সে স্থানসহ আরও অনেক স্থানে এধরণের বিভাজনের দৃশ্য দেখা যায়।

কুরআনে উল্লেখিত এই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো আমেরিকার 'University of Colorado'- এর ভূতত্ত্ব বিদ্যার প্রফেসর ও বিখ্যাত সমুদ্র বিজ্ঞানী ড. উইলিয়াম হেইয়ের দ্বারাও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত।

পাহাড়-পর্বত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত

পৃথিবীর উপরিভাগ বহুসংখ্যক দৃঢ় প্লেটে বিভক্ত যার ঘনত্ব প্রায় ১০০ কি. মি.। Aesthenosphere (এসথেনাসফিয়ার) নামে অংশত গলিত মণ্ডলে এই প্লেটগুলো ভাসমান। প্লেটগুলোর সীমানায় পাহাড়-পর্বত গঠিত হয়। পৃথিবীর কঠিন উপরিতল সমুদ্রের ৫ কি. মি. নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং বৃহৎ পাহাড়-পর্বতের প্রায় ৮০ কি. মি. নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পাহাড়-পর্বত দৃঢ়, নিশ্চল রয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে পাহাড়-পর্বতের শক্তিশালী ভিত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا -

"তিনি পাহাড়-পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" –সূরা আন-নাযি'আত ঃ ৩২

একই রকম বর্ণনা কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও রয়েছে।

" তারা কী লক্ষ্য করে না পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে?" –সূরা আল-গাশিয়াহ ঃ ১৯

"তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে এটি তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে।" -সূরা লুকমানঃ ১০

"এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে।" -সূরা নাহল ঃ ১৫

এভাবেই পাহাড়-পর্বতের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত তথ্যসমূহ ভূতত্ত্ব বিদ্যার সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার

প্রফেসর দুর্গা রাও, বিশ্ববিখ্যাত অভিজ্ঞ সামুদ্রিক ভূতত্ত্ববিদ এবং জেদ্দার 'King Abdul Aziz University'-এর প্রফেসর তাঁকে নীচের আয়াতের উপর মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল ঃ

"অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন সে তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।" –সূরা আন-নূর ৪০

প্রফেসর রাও বলেন, সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অতিসম্প্রতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিশ্চিত হতে পেরেছে। কোন কিছুর সাহায্য ব্যাতিরেকে মানুষ ২০ মিটার থেকে ৩০ মিটারের অধিক পানির নীচে মানুষ ডুব দিতে পারে না এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহের ২০০ মিটারের অধিক পানির নীচে বাঁচতে পারে না। এই আয়াতটি সকল সমুদ্রের দিকে নির্দেশ করে না, কারণ সব সমুদ্রের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের স্তর নেই। আয়াতটি শুধুমাত্র গভীর সমুদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এক বিশাল গভীর সমুদ্রের অন্ধকার"। দুটি কারণের স্বাভাবিক ফল হচ্ছে একটি গভীর সমুদ্রের এই স্তরবিশিষ্ট অন্ধকার ঃ

১. রংধনুতে সাতটি রংয়ের সমন্বিত একটি আলোক রশ্মি দৃশ্যমান হয়। রংগুলো হল-বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল (বেনীআসহকলা)। আলোক রশ্মিটি পানিকে ভেদ করার সময় প্রতিসরণ (রশ্মি বাঁকিয়ে যাওয়ার নাম প্রতিসরণ) ঘটে। উপরিভাগের ১০ মিটার থেকে ১৫ মিটার পর্যন্ত পানি প্রায় লাল রং শোষণ করে নেয়। সে কারণে কোন ডুবুরি পানির ২৫ মিটার নীচুতে আহত হলে সে তার রক্তের লাল রং দেখতে পায় না, কেননা ঐ গভীরতায় লাল রং পৌঁছে না। একইভাবে কমলা রং ৩০ মিটার থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে, হলুদ রং ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে, সবুজ রং ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে এবং সবশেষে আসমানি রং ২০০ মিটার এবং বেগুনী ও নীল রং ২০০ মিটারের অধিক দূরত্ব অতিক্রমের পর শোষিত হয়। বিভিন্ন স্তরে রংগুলোর ক্রমাগত শোষিত হবার ফলে ক্রমশ সমুদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ আলোর স্তর অন্ধকারে পরিণত হয়। পানির ১০০০ মিটার গভীরতার নীচে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

২. সূর্যের রশ্মি মেঘ দ্বারা শোষিত হয়ে বিক্ষিপ্ত আলোতে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে মেঘের নীচে অন্ধকারের একটি স্তর তৈরি করে। যা অন্ধকারের প্রথম স্তর। যখন আলোক রশ্মি সমুদ্রের উপরিভাগে পৌঁছে তখন তা পৃষ্ঠভাগের ঢেউয়ের সাথে প্রতিফলিত হয়ে এটিকে আলোকিত করে তোলে। সেহেতু ঢেউগুলোই আলোকে প্রতিফলিত করে এবং অন্ধকারের সৃষ্টি করে। অপ্রতিফলিত আলো সমুদ্রের গভীরতায় প্রবেশ করে। তাই সমুদ্রের

দুটি অংশ রয়েছে। এর উপরিভাগ আলোয় ও উদ্ভাসিত এবং গভীরতায় অন্ধকার। ঢেউয়ের কারণে সমুদ্রের গভীর অংশ থেকে উপরিভাগ ভিন্ন।

অভ্যন্তরীণ ঢেউয়ের মধ্যে সাগর ও মহাসাগরের গভীর পানি অন্তর্ভূক্ত কারণ গভীর সমুদ্রের পানির ঘনত্ব তার উপরিভাগের পানির চেয়ে বেশি। অভ্যন্তরীণ ঢেউয়ের নীচ থেকেই অন্ধকার শুরু হয়। এমনকি গভীরসাগরে গভীরে বসবাসকারী মাছও কিছু দেখতে পায় না, নিজেদের শরীরের আলোই তাদের আলোর একমাত্র উৎস।

কুরআন এ বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করে

"অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রে গভীর অন্ধকারের মত, যাকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উদ্বেলিত করে ।"

অপরকথায়, এ ঢেউগুলোর উপর বিভিন্ন রকমের ঢেউ রয়েছে, যেমন- মহাসাগরের উপরে যা পাওয়া যায়। কুরআনের আয়াতটি বলতে থাকে, "যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার।"

মেঘগুলো একের উপর এক প্রতিবন্ধক যা পরবর্তীতে বিভিন্ন স্তরে রংয়ের শোষণের মাধ্যমে গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করে।

পরিশেষে প্রফেসর দুর্গা রাও এই বলেন যে, "১৪০০ বছর পূর্বে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এ বিষয়টি এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। তাই তথ্যগুলো অবশ্যই কোন অলৌকিক উৎস থেকে প্রাপ্ত।"

জীব বিজ্ঞান

প্রতিটি জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে

কুরআনের আয়াতটিতে লক্ষ্য করি ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

"কাফেররা কী ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। এরপরও কী তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" –সূরা আম্বিয়া ঃ ৩০

বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতির কারণে বর্তমানে শতকরা ৮০ ভাগ পানি দ্বারা তৈরি কোষের সারবস্তু সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান এটাও জানিয়েছে যে, অধিকাংশ জীবের গঠনে শতকরা ৫০-৯০ ভাগ পানি এবং প্রত্যেক জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পানি অপরিহার্য। প্রত্যেক প্রাণী যে পানি থেকে সৃষ্টি তা ১৪ শতাব্দি পূর্বে কোন মানুষের পক্ষে কী অনুমান করা সম্ভবপর ছিল? আরবের মরুঅঞ্চলের কোন মানুষের পক্ষে এ ধরণের অনুমান কী কল্পনাযোগ্য হতো যেখানে সর্বদা পানির দুষ্প্রাপ্যতা ছিল?

কুরআনের পানি দ্বারা প্রাণীর সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ـ

"আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" –সূরা আন-নূর ঃ ৪৫

নীচের আয়াতটি পানি দ্বারা মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বলে–

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۔

"তিনিই পানি থেকে মানবকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম।" – সূরা আল-ফুরক্বান ঃ ৫৪

পদার্থ বিজ্ঞান

অতিপারমাণবিক কণিকার অস্তিত্ব

'পরমাণুবাদ' প্রাচীনকালে একটি সুপরিচিত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। মূলত প্রায় ২৩ শতাব্দিকাল পূর্বে গ্রীকরা বিশেষতঃ গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস কর্তৃক এই তত্ত্বটি প্রস্তাবিত হয়েছিল। এই তত্ত্বটি মূলত গ্রীকরা প্রস্তাব করেছিল, তবে ডেমোক্রিটাস এবং তার পরবর্তী লোকেরা ধারণা করত যে, পরমাণু হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক। আরবরাও একই রকম বিশ্বাস করতো। আরবী শব্দ ذرة (জাররাহ্)-এর অতিসাধারণ অর্থ হচ্ছে পরমাণু। বর্তমানে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, পরমাণু বিভাজ্য। পরমাণু যে বিভাজিত হতে পারে তা বিংশ শতাব্দির আবিষ্কার। এমনকি ১৪০০ বছর পূর্বে এই ধারণা আরবের কারও জানা ছিল না। সেজন্য ذرة (জাররাহ্) ছিল একটি সীমা যা কেউ অতিক্রম করতে পারত না। তথাপি নিচের আয়াতটি এই সীমা স্বীকার করে নাঃ

কাফিরগণ বলে-ক্বিয়ামত আমাদের নিকট আসবে না। বল, না, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদের নিকট তা অবশ্য অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের জ্ঞানী। তাঁর থেকে লুক্কায়িত নেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকণা, আকাশ ও পৃথিবীতে, না তার থেকে ছোট আর না তার থেকে বড় (কোনটাই নেই লুক্কায়িত)। সবই আছে (লাওহে মাহফুয নামক) এক সুস্পষ্ট কিতাবে। –সূরা সাবা ঃ ৩

"আর তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টির আড়ালে নেই এমন অণু পরিমাণ, যা আছে পৃথিবীতে, আর না আছে আসমানে, না তাথেকে ছোট বা না তাথেকে বড় কোন বস্তু, যা (লেখা) আছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে। –সূরা ইউনূস ঃ ৬১

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহর অসীম জ্ঞান, তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুর জ্ঞানের কথাই বলে। তারপর এটি বলে যে, পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্ সচেতন। এভাবে আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, যে সত্যটি আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান

উদ্ভিদকে জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছে

পূর্বে মানুষ জানত না যে, উদ্ভিদের মাঝেও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ রয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মতে, প্রত্যেক উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে। এমনকি সমজাতীয় লিঙ্গ বিশিষ্ট উদ্ভিদেরও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে।

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۔

"আর আকাশ থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন, আর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন লতা-যুগল উৎপন্ন করি, যার একেকটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।" –সূরা ত্ব-হাঃ ৫৩

ফল জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ -

"আর সকল প্রকারের ফল হতে। সেখানে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।" –সূরা রা'দঃ ৩

ফল হচ্ছে উৎকৃষ্ট উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি। ফল উৎপাদনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে ফুল পাওয়া যায়; এই ফুলে পুরুষ অঙ্গ পুংকেশর ও স্ত্রী অঙ্গ গর্ভকেশর রয়েছে। কোন ফুলের স্ত্রী অঙ্গে যখন পরাগের মাধ্যমে পুংকেশর প্রবিষ্ট হয়, তখন সে ফুল হয় গর্ভবতী পরে এই ফল পরিপক্ক হয় এবং তার বীজ ছড়ায়। সকল ফলের মধ্যেই যে পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ রয়েছে, তা কুরআনে উল্লিখিত এক মহাসত্য।

কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ফল অনিষিক্ত (গর্ভহীন) ফুল থেকে উৎপন্ন হতে পারে যেমন, কলা, বিশেষ প্রকারের আনারস, ডুমুর, কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি। অবশ্য এসব ফল তাদের অন্য ধরণের গাছগাছালি থেকেও উৎপন্ন হয়, যেসব গাছগাছালিতে সুস্পষ্ট যৌন-প্রজনন প্রক্রিয়া দেখা যায়।

সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ -

"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহন কর।" –সূরা আয-যারিয়াতঃ ৪৯

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কিত এ আয়াত মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও ফলসহ সবকিছুকে বুঝায়। এমনকি এটা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত বিদ্যুতের পরমাণুকেও বুঝায়।

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ -

"পূত পবিত্র সেই সত্তা যিনি প্রত্যেকটির জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যা উৎপন্ন করে যমীন আর তাদের নিজেদের ভিতরেও আর সে সবেও যা তারা জানে না।" –সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬

কুরআন এখানে বলে যে, বর্তমানে মানুষ যা জানে না ও ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে সেগুলোসহ সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাণী বিজ্ঞান

প্রাণী ও পাখি দলীয়ভাবে বসবাস করে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ -

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর দু'ডানা দ্বারা উড়ন্ত এমন কোন পাখি নেই, যারা তোমাদের মত একটি উম্মাত নয়।" –সূরা আন-আনআম ঃ ৩৮

গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্রাণী ও পাখি দলগতভাবে বাস করে; উদাহরণস্বরূপ- তারা সুসংগঠিত হয় এবং একত্রে কাজ ও বসবাস করে।

পাখির উড্ডয়ন

পাখির উড়া সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ -

"তারা কী উড়ন্ত পাখিকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীসের জন্যে রয়েছে নিদর্শনাবলী ।" (নাহ্ল ঃ ৭৯)

নীচের আয়াতে একই রকম বর্ণনা পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

"তারা কী তাদের উপর দিকে পাখীগুলোর প্রতি খেয়াল করে না। যারা ডানা মেলে আবার গুটিয়ে নেয়? দয়াময় ছাড়া অন্য কেউই তাদেরকে (উপরে) ধরে রাখে না। তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।"

আরবী শব্দ أَمْسَكَ (আমসাকা)-এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, কারো হাত উপরে রাখা, আটক করা, ধরে রাখা, কাউকে পিছন থেকে ধরে রাখা', অর্থাৎ এখানে এটিই প্রকাশ করে যে, আল্লাহতায়ালাই নিজস্ব ক্ষমতাবলে পাখিদের আকাশে ধরে রাখেন। আয়াতগুলোর মাধ্যমে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, পাখির চলাচল পুরোপুরি সৃষ্টিকর্তার নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ করে যে, নির্দিষ্ট প্রজাতির এমন কিছু পাখি রয়েছে, যাদের চলাচলে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচীর উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় শুধুমাত্র পাখির 'genetic code' (বংশানুগতির তথ্য বা সংকেতাবলী জীবকোষস্থিত Chromosome - এ রক্ষিত থাকে)- এ সঞ্চিত গমনাগমন সম্পর্কিত কর্মসূচীর কারণেই এ ধরণের পাখির বাচ্চারা পর্যন্ত দীর্ঘ ও দুর্গম যাত্রাপথের উদ্দেশ্যে সফরে সাফল্য অর্জনে সক্ষম-যাদের দেশান্তরে গমনাগমনের কোন রূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা এমনকি কোন পথ নির্দেশনাও থাকে না। শুধু তাই নয়, একইভাবে তারা যে জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যথারীতি সে স্থানে ফিরেও আসে।

প্রফেসর হামবার্গার তাঁর 'Power and Fragility'- বইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী 'mutton-bird'- নামক এক প্রকার পাখির উদাহরণ দিয়েছেন, এ পাখিরা তাদের আবাসস্থল থেকে যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন জায়গার উদ্দেশ্যে প্রায় ২৪, ০০০ কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করার পর আবার যখন তারা সে আবাসস্থলে ফিরে আসে, তখন তাদের গোটা যাত্রাপথের রেখাচিত্র দাঁড়ায় অনেকটা '৪'-এর মত। এই পাখিরা তাদের গন্তব্যস্থানে পৌছতে ৬ মাসেরও বেশি সময় নেয়, কিন্তু সে স্থান থেকে আবাসস্থলে ফিরে আসতে সর্বাধিক সময় লাগে এক সপ্তাহের মত। অতএব, আঁকাবাঁকা এ ধরণের জটিল সফরের তথা পথযাত্রার পুরো নির্দেশনাই এই প্রজাতির পাখির স্নায়ুকোষে অবশ্যই ধারণকৃত থাকতে হবে। এই জটিল সফর ও প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচী নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। আমাদের কী এই সুনির্ধারিত কর্মসূচীর প্রণেতার স্বরূপ সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত নয়?

মৌমাছি

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ - ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا -

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, বাসা তৈরি কর পাহাড়ে, বৃক্ষে আর উঁচু ঢালে। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি মেনে চল।

– সূরা আন-নাহল : ৬৮-৬৯

১৯৭৩ সালে ভন-ফ্রিচ মৌমাছির আচরণ ও যোগাযোগের উপর গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান। কোন নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পেলে মৌমাছিটি আবার মৌচাকে ফিরে যায় এবং তার সহকর্মী মৌমাছিদেরকে সেখানে যাওয়ার সঠিক গতিপথ ও মানচিত্র 'মৌমাছির নৃত্য' নামক আচরণের মাধ্যমে তা জানায়। অন্যান্য কর্মী মৌমাছিকে তথ্য জানানোর উদ্দেশ্যে এ ধরণের আচরণ আলোকচিত্র ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। নিজস্ব দক্ষতার সাহায্যে মৌমাছি কিভাবে তার পালনকর্তার প্রশস্ত পথের সন্ধান পায় তা কুরআনের উপরের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

স্ত্রী মৌমাছি হচ্ছে কর্মী মৌমাছি বা সৈনিক মৌমাছি। সূরা আল-নাহলের ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে মৌমাছির জন্য স্ত্রী লিঙ্গ فَاسْلُكِىْ (ফাসলুকী) ও كُلِىْ (কুলী) ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ যেসব মৌমাছি খাদ্য সংগ্রহের কাজ করে, তা স্ত্রী মৌমাছি। অন্যকথায় সৈনিক বা কর্মী মৌমাছি হচ্ছে স্ত্রী মৌমাছি। মূলত শেক্সপিয়ারের 'Henry the Forth' নাটকের কিছু চরিত্র মৌমাছি সম্পর্কিত বর্ণনা করে যে, মৌমাছিরা হল সৈনিক এবং তাদের একটি রাজা রয়েছে। শেক্সপিয়ারের যুগে মানুষ মৌমাছি সম্পর্কে এরকমই ধারণা করত। তারা মনে করত যে, কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ এবং ঘরে ফিরে তাদেরকে একটি রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। যাহোক এটা সত্য নয়। কর্মী মৌমাছিরা হল স্ত্রী এবং তারা রাজা মৌমাছির কাছে নয় বরং রাণী মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। কিন্তু এ বিষয়টি মাত্র ৩০০ বছর পূর্বে আধুনিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

মাকড়সার জাল এক ভঙ্গুর বাসস্থান

সূরা আল-আনকাবুতে কুরআন বর্ণনা করে যে,

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে মুনিব হিসেবে "তাদের উপমা গ্রহণ করে, সেই মাকড়সার মত, যে নিজের জন্য একটি ঘর বানায়; অথচ নিঃসন্দেহে সর্বাধিক ভঙ্গুর আবাসস্থল হচ্ছে, মাকড়সার ঘর, কিন্তু তারা যদি তা জানত।"

মাকড়সার ভঙ্গুর, সুন্দর ও দুর্বল ঘরের দৈহিক বর্ণনার সাথেসাথে মাকড়সার ঘরের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের অসারতা; বহুসংখ্যকবার স্ত্রী মাকড়সা কর্তৃক তার সহকর্মী পুরুষ মাকড়সাকে হত্যার বিষয়টির উপরও কুরআন জোর দেয়।

আমরা শুধুমাত্র এখন এ ব্যাপারে অবহিত যে, মধুর রোগ নিরাময়ের গুণ রয়েছে এবং এটা মৃদু অ্যানটিসেপটিক জাতীয় (বিশেষত জীবাণু নাশ করে ক্ষত ইত্যাদির পচন রোধ করতে পারে এমন রাসায়নিক পদার্থকে অ্যানটিসেপটিক বলে)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ানরা ক্ষত শুকানোর জন্য মধু ব্যবহার করতো। মধুর ঘনত্বের কারণে ক্ষত স্থানে কোন ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া জন্মাতে পারে না।

ইংল্যান্ডের নার্সিং হোমে ২২ জন দুরারোগ্য বক্ষব্যাধি এবং অ্যালযেইমার্স আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য সন্ন্যাসীনি সিস্টার ক্যারোলির দ্বারস্ত হয় এবং তাদের চিকিৎসায় নাটকীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, কারণ তিনি এ এদের চিকিৎসায় 'propolis' নামক একটি বিশেষ ধরণের উপাদান ব্যবহার করেন যা মৌমাছি মধুকোষকে ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে উৎপন্ন করে।

বিশেষ গাছের এলার্জিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে সেই গাছের মধু খাওয়ালে তার সেই এলার্জির প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে। মধু শর্করা (বহু ফলে ও মধুতে যে ধরণের চিনি পাওয়া যায়) ও ভিটামিন 'K' সমৃদ্ধ।

মধুর উৎস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন ধারণকৃত জ্ঞান কুরআন আসার কয়েক শতাব্দী পরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

শারীরবৃত্ত বিজ্ঞান

রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও দুধ

মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে নাফীস রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া উপস্থাপন করার ৬০০ বছর পূর্বে এবং পশ্চিমা বিশ্বে উইলিয়াম হারওয়ের এই মত উপস্থাপনের ১০০০ বছর পূর্বেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। অন্ত্রে (পাকস্থলী থেকে মলদ্বার পর্যন্ত খাদ্যনালীর নিম্নাংশ) কী ঘটে তা প্রায় ১৩ শতাব্দি পূর্বে জানা যায় কারণ অঙ্গপ্রতঙ্গ অবশ্যই পরিপাকক্রিয়ার শোষণের মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয় । কুরআনের একটি আয়াত দুধের উপাদানের উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করে যা এই মতগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ।

উপরের মতগুলো সম্পর্কে কুরআনের আয়াত বুঝতে হলে, এটা জানা দরকার যে, অন্ত্রে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং সেখানে খাদ্য থেকে যেসব খাদ্যরস শোষিত হয় তা এক জটিল প্রক্রিয়ায় রক্তে মিশে যায়; কখনো কখনো তা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে লিভারের (যকৃত) মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। তারপর সেগুলোকে রক্ত শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রতঙ্গে পৌছে দেয়, যার মধ্যে দুধ উৎপাদনকারী লালাগ্রন্থিও অন্তর্ভুক্ত।

সহজ কথায়, অন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বিশেষ ধরণের কিছু নির্যাস অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গে পৌছায়।

কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো বুঝতে হলে শারীরবৃত্তীয় বৈজ্ঞানিক ধারণাটি অবশ্যই পুরোপুরি সঠিকভাবে মূল্যায়িত করতে হবেঃ

"তোমাদের জন্য গবাদি পশুতেও অবশ্যই শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তোমাদেরকে পান করাই ওদের পেটের গোবর আর রক্তের থেকে উৎপন্ন বিশুদ্ধ দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য খুবই উপদেয়।" আর গবাদি পশুর ভিতরে তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এ নীতিগর্ভ উপমাটি সেসব মানুষের দুর্বলতার দিকেও ইঙ্গিত করে যারা দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো কাছে সাহায্য চায়।

পিঁপড়ার জীবনপ্রণালী ও যোগাযোগ

এপ্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন–

"আর সুলাইমানের সামনে তাঁর বাহিনীকে সমবেত করা হয়েছিল, জীন ও মানুষ ও পাখিদের থেকে; আর তাদের কুচকাওয়াজ করানো হলো। তারপর যখন তাঁরা পিঁপড়াদের উপত্যকায় এসেছিলেন

তখন একজন পিঁপড়া বলল- "ওহে নমল জাতি! তোমাদের বাড়িঘরে ঢুকে যাও, সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী যেন তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষে না ফেলে" – আন-নমলঃ ১৭-১৮

পিপড়াদের একে অপরের সাথে কথা বলা এবং উন্নত পর্যায়ের বার্তা আদান-প্রদান করার বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত হওয়ার কারণে অতীতে কিছু মূর্খ মানুষ কুরআনকে রূপকথার গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করে এর প্রতি ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ করত। সাম্প্রতিক কালে গবেষণায় পিঁপড়ার জীবনপ্রণালী সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা জানা গেছে, যে সম্পর্কে মানুষ পূর্বে জ্ঞাত ছিল না। গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের জীবনপ্রণালীর সাথে যে প্রাণী বা কীটপতঙ্গের জীবনপ্রণালীর সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে তা হল পিঁপড়া। এ সম্পর্কে নীচের তথ্যগুলো থেকে বিষয়টির যথার্থতা প্রমাণ করা যায় ঃ

(ক) মানুষের মতই তাদের মৃতদেহকে মাটিতে সমাহিত করে।

(খ) পিপীলিকাদের উন্নত পর্যায়ের শ্রম বিভাজন পদ্ধতি রয়েছে ফলে তাদের মধ্যে ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, সর্দার (শ্রমিকদের প্রধান), শ্রমিক ইত্যাদি রয়েছে।

(গ) কোন কোন সময় তারা খোশগল্প করতে একত্রিত হয়।

(ঘ) নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য পিপড়াদের অত্যন্ত অগ্রসর পন্থা রয়েছে।

(ঙ) পিপীলিকারা নিয়মিত বাজার বসায় যেখানে তারা পণ্য বিনিময় করে।

(চ) শীতকালে তারা দীর্ঘদিনের জন্য খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখে এবং খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত হলে তারা শিকড় কেটে দেয়; মনে হয় তারা এটা বুঝতে পারে যে, খাদ্যশস্যকে অঙ্কুরিত অবস্থায় রেখে দিলে তা পচে যাবে। যদি তাদের মজুদকৃত খাদ্যশস্য বৃষ্টির কারণে ভিজে যায়, তাহলে তারা এগুলোকে রোদ্রে শুকাতে বাইরে যায় এবং শুকানোর পর আবার ভিতরে নিয়ে যায়; মনে হয় তারা এটাও জানে যে, আদ্রতায় খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত হবে, ফলে তা পচে যাবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

মধু ঃ মানুষের জন্য রোগমুক্তি

মৌমাছি বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও ফলের রস আহরণ করে এবং নিজের শরীরের ভিতরে মধু তৈরির পর তা মোমের কোষে জমা করে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে মানুষ জানতে পেরেছে যে, মধু মৌমাছির পেট থেকে আসে। অথচ এ ধ্রুবসত্যটি ১৪০০ বছর আগে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاۤءٌ لِّلنَّاسِ –

"তাদের পেট থেকে বেরিয়ে আসে একটি পানীয়, বিচিত্র যার বর্ণ, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি।" –আন-নাহল ঃ ৬৯

তাদের পেটে যা আছে তাথেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই (দুধ) আর ওতে তোমাদের জন্য আছে বহুবিধ উপকার। তোমরা তাথেকে খাও (গোশত)।

গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন সম্পর্কে কুরআনের ১৪০০ বছর আগের বর্ণনা আর অতি সাম্প্রতিক আধুনিক শারীরবৃত্ত বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে তাতো বিস্ময়করভাবে মিল রয়েছে।

ভ্রূনতত্ত্ব (Embryology)

কয়েক বছর আগে ইয়েমেনের প্রখ্যাত পণ্ডিত শাইখ আবদুল মাজিদ আযিনদানীর নেতৃত্বে একদল মুসলিম বিদ্বান কুরআন ও হাদীস থেকে ভ্রূণ বিজ্ঞানে তথ্য ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। সেক্ষেত্রে তারা কুরআনের এ উপদেশকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেনঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ –

"অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।"

কুরআন ও হাদীস থেকে ভ্রূণসংক্রান্ত সকল তথ্য একত্রিত করে তা ইংরেজীতে অনুবাদের পর এগুলো সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণতত্ত্বের অধ্যাপক ও'Anatomy' (জীবদেহের গঠনসংক্রান্ত বিজ্ঞান) বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. কেইথ মূরের কাছে নেয়া হয়। বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তিনি ভ্রূণতত্ত্বে সর্বোচ্চ প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ ও গবেষক।

সেখানে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সর্ম্পকে তাঁর মত প্রদান করতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়। সতর্কতার সাথে সেগুলো যাচাই করার পর ড. মূর বলেন যে, ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআনে ও হাদীসে উল্লিখিত অধিকাংশ তথ্য ভ্রূণতত্ত্বের আধুনিক আবিষ্কারের সাথে হুবুহু মিলে যায় এবং কোনক্রমেই এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। তিনি আরও বলেন, কিছু আয়াত রয়েছে যার বৈজ্ঞানিক যথার্থতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে অপারগ। সেগুলো সত্য না মিথ্যা তাও তিনি বলতে পারেননি, কারণ ঐ আয়াতগুলোতে বর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে তিনি নিজেই জ্ঞাত নন। তাছাড়া আধুনিক ভ্রূণবিদ্যায় ও ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত আধুনিক লেখায় তথ্যগুলো সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ভ্রূণবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের জন্মের পূর্বের বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞানালোচনা।

তেমনি একটি আয়াত হল ঃ – اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ – خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ –

"পড়ুন আপনার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।" – সূরা আলক্ব ঃ ১-২

আরবী শব্দ عَلَقٍ ('আলাক্ব') এর অর্থ 'জমাট রক্ত' ছাড়াও আরেকটি অর্থ রয়েছে, তা হল, জোঁকের মত এক প্রকার বস্তু যা দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

ড. মূর জানতেন না যে, প্রাথমিক দশায় একটি ভ্রূণকে জোঁকের মত দেখায় কিনা। একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্যে তিনি ভ্রূণের প্রাথমিক দশা পরীক্ষা করতে গবেষণা শুরু করেন এবং দেখেন যে, প্রাথমিক দশায় ভ্রূণের আকৃতির সাথে একটি জোঁকের আকৃতি মিল রয়েছে। এ দুইয়ের মধ্যে বিস্ময়কর মিল দেখে তিনি অভিভূত হন। একইভাবে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অজানা অনেক জ্ঞান তিনি কুরআন থেকে লাভ করেন।

কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত ভ্রূণতাত্ত্বিক তথ্য সম্পর্কে ড. মূর আশিটির মত প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রফেসর মূর বলেন, ভ্রূণসংক্রান্ত বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারের সাথে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত তথ্যগুলো সম্পূর্ণ সংগতিশীল; কিন্তু যদি ত্রিশ বছর পূর্বে আমাকে এই প্রশ্নগুলো করা হত, তাহলে আমি বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে এগুলোর অর্ধেকেরও উত্তর দিতে পারতাম না।

১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত সপ্তম চিকিৎসা সম্মেলনে তিনি বলেন, 'কুরআনের মাধ্যমে মানুষের বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সাহায্য করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে এগুলো যে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে তা আমার কাছে পরিষ্কার, কারণ এগুলোর অধিকাংশ জ্ঞান বহু শতাব্দি পরেও আবিষ্কৃত হয়নি। তাছাড়া আমার কাছে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) অবশ্যই আল্লাহর নবী।

আগে ড. মূর 'The Developing Human' নামে একটি বই রচনা করেছিলেন। কুরআন থেকে নতুন জ্ঞান অর্জনের পর তিনি ১৯৮২ সালে বইটির তৃতীয় সংস্করণ লিখেন। একক লেখকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে বইটি পুরস্কৃত হয়। বইটি বিশ্বের বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের (Medical) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভ্রূণতত্ত্বের পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হয়।

আমেরিকার হিউস্টনের বেইলার কলেজ অভ্ মেডিসিনের ধাত্রীবিদ্যা এবং স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. জো লিগ সিম্পসান বলেন যে, মুহাম্মাদের বর্ণিত হাদীসগুলো সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়নি। তাই পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ধর্মের (ইসলামকে ইঙ্গিত করে) সাথে বংশগতিবিষয়ক বিজ্ঞান বা প্রজনন-শাস্ত্রের কোন পার্থক্য নেই; উপরন্তু প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে ধর্ম (ইসলাম) তাঁর বিস্ময়কর জ্ঞানকে যুক্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে পথ দেখাতে পারে... কুরআনে উল্লিখিত তথ্যগুলো কয়েক শতাব্দি পরে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা কুরআনের জ্ঞান ঈশ্বর (আল্লাহ) থেকে আসার কথাই প্রমাণ করে।

মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যে থেকে নির্গত তরল পদার্থের ফোঁটা

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ – خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ – يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ –

"সুতরাং মানুষ ভেবে দেখুক কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি থেকে। তা বের হয় পুরুষের যৌন স্থান ও স্ত্রীর যৌন স্থানের সম্মিলনের (পরিনতিতে)। –সূরা আত্-ত্বারিক্ব ৫-৭

অনেকেই এই আয়াতের অর্থ 'যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষের অস্থিসমূহের মধ্য হতে' হিসেবে করেছেন। তবে এই অর্থটি যতটা না অনুবাদ তার চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়। জন্মপূর্ববর্তী অবস্থায় বিকাশের সময়, পুরুষ ও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়গুলো যেমন, অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় কিডনির নিকটে মেরুদণ্ড স্তম্ভ এবং একাদশ ও দ্বাদশ পাঁজরের (বুকের ও পার্শ্বদেশের অস্থি বা হাড়) হাড়ের মাঝে বিকশিত হওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে এগুলো নীচে নেমে আসে, স্ত্রীর ডিম্বাশয় মেরুদণ্ডের নীচে ও নিতম্বের মধ্যকার অস্থিকাঠামোর মধ্যে এসে থেমে যায়, পক্ষান্তরে, পুরুষের অণ্ডকোষ নালী দিয়ে অণ্ডকোষের থলিতে নেমে আসার ধারাবাহিকতা জন্মের পূর্ব পর্যন্ত বজায় থাকে। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় জনেন্দ্রীয় নীচে নেমে আসার পরেও মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মাঝে অবস্থিত উদর সংক্রান্ত বড় ধমনি (হৃৎপিণ্ডের বাম দিক থেকে রক্তবহনকারী প্রধান ধমনী) থেকে এ অঙ্গগুলো উদ্দীপনা ও রক্ত সরবরাহ গ্রহণ করে। এমনকি রসজাতীয় পদার্থ বহনকারী নালী এবং শিরাগুলো একই এলাকার স্থানে মিলিত হয়।

অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ (নুতফাহ)

পবিত্র কুরআন কমপক্ষে ১১ স্থানে মানুষকে 'নুতফাহ' থেকে সৃষ্টি করার কথা বলে, যার অর্থ অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ অথবা কোন কাপের নীচের তলায় অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ। এ বিষয়টি কুরআনের সূরা মু'মিনূন ঃ ১৩ নং আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে যে, ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য গড়ে তিন মিলিয়ন শুক্রকীটের মধ্য থেকে মাত্র একটি শুক্রকীট প্রয়োজন। এটির আরেক অর্থ হচ্ছে, নিষিক্তকরণের জন্য শুধুমাত্র নির্গত শুক্রকীটের ১/৩ মিলিয়ন ভাগ অথবা ০.০০০০৩% দরকার।

একই ধরণের বর্ণনা কুরআনের সূরা নাহল ঃ ৪, সূরা কাহফঃ ৩৭, সূরা ফাতিরঃ ১১, সূরা ইয়াসীনঃ ৭৭, সূরা মুমিনঃ ৬৭, সূরা নাজমা ৪৬, সূরা ক্বিয়ামাহ ঃ ৩৭, সূরা দাহর ঃ ২ এবং সূরা আবাসাঃ ১৯ নং আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে।

তরল পদার্থের নির্যাস (সুলালাহ)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ –

"অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন, তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।" –সূরা সাজদাহ ঃ ৮

আরবী শব্দ سُلٰلَةٌ 'সুলালাহ' মানে তরল পদার্থের নির্যাস বা অবিভক্ত কোন বস্তুর সর্বোত্তম অংশ।

আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, পুরুষের দেহে উৎপন্ন কয়েক মিলিয়ন শুক্রাণু থেকে ডিম্বাণুতে প্রবেশকারী একটি মাত্র শুক্রাণুই নিষিক্তকরণের জন্য প্রয়োজন হয়। কয়েক মিলিয়ন থেকে ঐ একটি মাত্র শুক্রাণুকেই কুরআনে 'সুলালাহ' বলা হয়েছে। আমরা বর্তমানে এটাও জানতে পেরেছি যে, নারীদেহে উৎপন্ন দশ হাজারের অধিক ডিম্বাণু থেকে একটি মাত্র ডিম্বাণুই নিষিক্ত হয়। দশ হাজার ডিম্বাণু থেকে ঐ একটি ডিম্বাণুকে কুরআনে 'সুলালাহ' বলা হয়েছে। তরল পদার্থ থেকে সুষমভাবে বের করে আনার অর্থেও 'সুলালাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তরল পদার্থ দ্বারা জননকোষ ধারণকারী নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংক্রান্ত তরল পদার্থকে বুঝায়। ডিম্বাণু উভয়কে নিষিক্তকরণের প্রক্রিয়ায় সুষমভাবে তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে বের করে আনা হয়।

মিশ্রিত তরল পদার্থ (নুতফাতুন আমশা-জ)

নীচের আয়াতটির দিকে লক্ষ্য করা যাক ঃ – إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে।" (আদ-দাহরঃ ২

আরবী শব্দ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (নুতফাতুন আমসা-য)-এর অর্থ হচ্ছে, মিশ্রিত তরল পদার্থ। কুরআনের অনেক তাফসীরকারকের মতে, মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ জাতীয় ধারক বা তরল পদার্থকে বোঝায়।

নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিশ্রিত হওয়ার পরেও ভ্রূণ নুতফা আকারে অবস্থান করে। মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে শুক্রাণুজাতীয় তরলকেও বুঝানো হতে পারে যা বিভিন্ন লালাগ্রন্থির নিঃসৃত রস হতে আসে। সেহেতু, نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (নুতফাতুন আমসা-জ)- এর অর্থ দাঁড়ায়, নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু এবং এগুলোর চতুর্পাশ্বের তরল পদার্থের কিছু অংশ।

ভ্রূনের লিঙ্গ নির্ধারণ

ডিম্বাণুর প্রকৃতি দ্বারা নয় বরং শুক্রাণুর প্রকৃতি দ্বারাই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিশুটি পুরুষ বা স্ত্রী কী হবে তা 'XX' বা 'XY' জাতীয় ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের উপর নির্ভর করে। ডিম্বাণু নিষিক্তকারী শুক্রের লিঙ্গ-ক্রোমোজোমের উপর ভিত্তি করে নিষিক্তকরণের সময়েই প্রাথমিকভাবে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যদি 'X' বহনকারী শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, তাহলে ভ্রূণ হয় স্ত্রীলিঙ্গ এবং যদি 'Y' বহনকারী শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, তাহলে ভ্রূণ হয় পুংলিঙ্গ।

কুরআন মাজীদে আল্লাহপাক বলেন-

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى

"তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, এক বিন্দু থেকে, যখন নির্গত হয়।" – সূরা আন্-নাজম্ঃ ৪৫-৪৬

আরবী শব্দ نُطْفَةٌ (নুতফাহ) অর্থ, সামান্য পরিমাণ তরল এবং تُمْنٰى (তুমনা) অর্থ স্খলিত বা নির্গত হওয়া। সেহেতু, নুতফাহ দ্বারা শুক্রানুকেই বোঝানো হয় কারণ শুক্রই স্খলিত হয়।

কুরআন মাজীদে আল্লাহপাক আরো বলেন-

"সে কী স্খলিত শুক্র ছিল না? অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল, নর ও নারী।" –সূরা আল-ক্বিয়ামাহ ঃ ৩৭-৩৯

এখানে আবারও مِنْ مَنِيٍّ يُّمْنٰى শব্দ দিয়ে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারনের জন্য দায়ী পুরুষ থেকে স্খলিত খুবই সামান্য পরিমাণ (এক ফোঁটা) শুক্রকে বুঝানো হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ শাশুড়ীরা নাতি আকাংক্ষা করে এবং যদি নাতনী হয় তাহলে সেজন্য প্রায় পুত্রবধূকে দায়ী করে। যদি তারা জানত যে, নারীর ডিম্বাণু নয় বরং পুরুষের শুক্রের প্রকৃতি লিঙ্গ নির্ধারণ করে! যদি দোষারোপ করতে হয়, তাহলে পুত্রবধূদেরকে দোষারোপ না করে বরং তাদের ছেলেদেরকে দোষারোপ করা উচিত; কারণ কুরআন ও বিজ্ঞান উভয় পুরুষের শুক্রকে শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী হিসেবে উল্লেখ করে!

তিনটি পর্দার অভ্যন্তরে ভ্রূণ সুরক্ষিত

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে।"

-সূরা আল-যুমার ঃ ৬

প্রফেসর ড. কেইথ মূরের মতে, কুরআনের এ তিন স্তরের অন্ধকার বলতে বোঝায়-

১) মায়ের গর্ভের সম্মুখের প্রাচীর

২) জরায়ুর প্রাচীর

৩) ভ্রূণের আবরণ অর্থাৎ ভ্রূণকে আবৃতকারী গর্ভফুলের অভ্যন্তরীণ অতি পাতলা পর্দা (তাছাড়াও এটিকে গর্ভফুল, ভ্রূণের পর্দা বা ঝিল্লি, অ্যামিনোটিক ফ্লুয়িড ইত্যাদি বলা হয়)

ভ্রূণের পর্যায়সমূহ

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত

করেছি, এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করেছি। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" –সূরা আল-মুমিনুনঃ ১২-১৪

এ আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেন যে, قَرَارٍ مَّكِيْنٍ (ক্বারারীম মাকীন) বা দৃঢ়ভাবে অটল এক বিশ্রামের স্থানে সুরক্ষিত অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। পিছনের মাংসপেশীর মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত পশ্চাতবর্তী মেরুদণ্ড স্তম্ভ দ্বারা জরায়ু সুসংরক্ষিত। তাছাড়াও গর্ভফুলের রস ধারণকৃত গর্ভস্থলী দ্বারা ভ্রূণ সুরক্ষিত। সুতরাং ভ্রূণের একটি সুসংরক্ষিত বসবাসের স্থান রয়েছে।

এ অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ বা মাংসপেশীতে পরিণত হয়, তার অর্থ যা আটকে থাকে। এটার অন্য অর্থ হল, জোঁকের মত নির্যাস। উভয় অর্থ বৈজ্ঞানিকভাবে কেননা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণ প্রাচীরে আটকে থাকে এবং জোঁকের মতোই দেখায়। তাছাড়া এটি জোঁকের মতোই আচরণ করে এবং মায়ের গর্ভফুলের মধ্য দিয়ে রক্ত সরবরাহ করে।

শব্দের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, রক্তপিণ্ড। গর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে রক্তপিণ্ডের স্তরে থাকাবস্থায় রক্তপিণ্ডটি তরল পদার্থবেষ্টিতে বদ্ধ থলির মাঝে সুতরাং ভ্রূণ একই সময়ে রক্তের আকৃতির পাশাপাশি জোঁকের আকৃতিও ধারণ করে। নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য কোরআনের জ্ঞানকে মানুষের বৈজ্ঞানিক তথ্য অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টার সাথে তুলনা করুন।

সর্বপ্রথম ১৬৭৭ সালে বিজ্ঞানী হাম এবং লীউওয়েনহৌয়েক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা মানুষের শুক্র পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা মনে করে ছিলেন যে, অতি সুক্ষাকৃতির মানুষকে ধারণকারী শুক্রকোষ নবশিশুর জন্ম দিতে জরায়ুতে বিকশিত হয়। এটি 'The Perforation Theory' বা 'ছিদ্রকরণ তত্ত্ব' নামে পরিচিত ছিল। যখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে,

চিত্রে আমরা একটা জোঁক ও মানব ভ্রূণের মধ্যে আকৃতির সাদৃশ্য দেখতে পাই। কুরআন ও সুন্নাহতে ঠিক যেভাবে মানবের বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে (Moore and others, .p. 37, modified from Intergrated Principles of Zoology, Hickman and others. Embyo drawing from The Developing Human, Moore and persaud, 5th ed., p. 73)

শুক্রাণুর চেয়ে ডিম্বাণু বড়, তখন বিজ্ঞানী ডি গ্রাফসহ অন্যরা ভাবলেন যে, ডিম্বাণুর মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতির ভ্রূণ বিকশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী মাওপারটুইস 'মাতা-পিতার দ্বৈত উত্তরাধিকার তত্ত্ব' ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

عَلَقَةً (আলাক্ব) রূপান্তরিত হয় مُضْغَةً (মুদগাহ)- তে এর অর্থ হচ্ছে, যা চিবানো হয় এবং এমন আঁটালো ও ছোট যা গামের মতো মুখে দেয়া যেতে পারে। (১) এ উভয় ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বলে ধরা হয়।

প্রফেসর ড. কেইথ মূর একটি প্লাস্টার সিল নিয়ে এটিকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের আকৃতির মতো তৈরি করে দাঁতে চিবিয়ে মুদগায় পরিণত করতে চেষ্টা করেন। তিনি এ প্রক্রিয়াকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের চিত্রের সাথে তুলনা করে দেখেন। দাঁত দিয়ে চিবানোর চিহ্নগুলো মেরুদণ্ড স্তম্ভের প্রাথমিক গঠন 'somites'- এর মতো দেখায়। এ مُضْغَةً (মুদগাহ) عِظَامٌ (ঈযাম) বা হাড়ে পরিণত হয়। হাড়গুলোকে মাংস বা মাংসপেশী لَحْمٌ (লাহম) পরানো হয়। তারপর আল্লাহ অন্য সৃষ্টিতে পরিণত করেন।

খ্যাতনামা মার্কিনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শাল জনসন এবং জীবদেহের গঠনসংক্রান্ত বিজ্ঞান (Anatomy) বিভাগের প্রধান এবং আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার থমসন জেফারসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দানিয়েল ইনস্টিটিউটের

সম্মানিত পরিচালক। তাঁকে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত কুরআনের এই আয়াতগুলোর উপর মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হলে। তিনি বলেন, ভ্রূণতাত্ত্বিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে কুরআনের আয়াতগুলো সমকালীন কোন মত হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, সম্ভবত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআন নাযিল হয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েক শতাব্দী পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে, তিনি হাসেন এবং স্বীকার করেন যে, প্রথমাবস্থায় আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কোন ক্ষুদ্র জিনিসকে ১০ গুণের বেশি বড় করে দেখা সম্ভব হত না এবং পরিষ্কার ছবিও দেখতে পারত না। তারপর তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ সা. যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন তাঁর সাথে আসমানী সম্পৃক্ততার ব্যাপারে আমি কোন বিরোধ দেখি না।"

ডা. কেইথ মুরের মতে, সারাবিশ্বজুড়ে গৃহীত ভ্রূণসংক্রান্ত উন্নয়ন স্তরের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ সহজেই বোধগম্য নয়, কারণ এটি স্তরগুলোকে সংখ্যাগতভাবে চিহ্নিত করে, যেমন, ১ম স্তর, ২য় স্তর ইত্যাদি। অন্যদিকে যে স্তরগুলো ভ্রূণ অতিক্রম করে তার শ্রেণীবিভাগ কুরআনের বর্ণনানুসারে পার্থক্যসূচক এবং সহজেই এগুলোর আকার-আকৃতি চিহ্নিত করা সম্ভব। এগুলো জন্মপূর্ব বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল এবং সহজে বোধগম্য ও বাস্তবধর্মী কৌশলী বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ধারণকারী।

নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলোতেও মানুষের ভ্রূণতাত্ত্বিক উন্নয়নের স্তরগুলো বর্ণিত হয়েছে ঃ "সে কী স্খলিত শুক্র ছিল না? অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।" (আল-ক্বিয়ামাহ ঃ ৩৭-৩৯) "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।" –আল-ইনফিতারঃ ৭-৮

ভ্রূণ আংশিকভাবে গঠিত এবং আংশিকভাবে অগঠিত

مُضْغَةٌ (মুদগাহ) এর পর্যায়ে ভ্রূণকে এবং এর অভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এর অধিকাংশই গঠিত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়নি।

প্রফেসর জনসনের মতে, আমরা ভ্রূণকে পূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনাকালে আমরা কেবলমাত্র সৃজিত অংশেরই বর্ণনা করি। আমার যদি ভ্রূণকে অপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করি, তখন কেবল অপূর্ণ অংশেরই বর্ণনা করি। তাহলে, ভ্রূণ কী পূর্ণ সৃষ্টি না অপূর্ণ সৃষ্টি? নিম্নে বর্ণিত আয়াতে ভ্রূণের উৎপত্তির এই স্তর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত "আংশিকভাবে গঠিত এবং আংশিকভাবে গঠিত হয়নি" অপেক্ষা কোন উত্তম বর্ণনা নেইঃ

"আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর রক্তপিন্ড থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য।" –সূরা হাজ্জঃ ৫

বৈজ্ঞানিকভাবে জানা যায় যে, বিকাশের প্রাথমিক ধাপে পার্থক্যসূচক কিছু কোষ এবং অপার্থক্যসূচক কিছু কোষ রয়েছে-অর্থাৎ কিছু অঙ্গ গঠিত এবং কিছু অঙ্গ তখনও অগঠিত।

কর্ণ ও চক্ষু ঃ ক্রমান্বয়ে বিকাশমান মানব ভ্রূণের মধ্যে প্রথমে শ্রবণশক্তির অনুভূতি আসে। ২৪ সপ্তাহ পরে ভ্রূণ শব্দ শুনতে পায়। পরবর্তীতে দৃষ্টিশক্তির অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং ২৮ সপ্তাহ পরে রেটিনা আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়। ভ্রূণে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটিতে দেখা যায় ঃ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ –

"এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ।" –সাজদাহঃ ৯

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।" –আদ-দাহরঃ ২

"তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের; কান, চোখ ও অন্তঃকরণ, তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক।" –আল-মুমিনূন ঃ ৭৫

উপরোক্ত আয়াতসমূহে চোখের আগে কানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে কুরআনের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে মিলে যায়।

সাধারণ বিজ্ঞান

হস্তাঙ্গুলির রেখাসমূহের ছাপ

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ – بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ –

"মানুষ কী মনে করে যে, আমি কখনো তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? হ্যাঁ, আমি তার আংগুলগুলো সঠিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম,।" – আল-ক্বিয়ামাহঃ ৩-৪

মৃত মানুষের হাড়গুলো মাটির মধ্যে বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত ও বিভক্ত হওয়ার পরেও এগুলোর পুনরুত্থান এবং বিচারের দিন সকল মানুষকে পৃথক পৃথক কিভাবে চিহ্নিত করা হবে সে ব্যাপারে কাফেররা প্রশ্ন করে। আল্লাহ উত্তর দেন যে, তিনি কেবলমাত্র আমাদের হাড়গুলোকে একত্রিত করা নয় বরং আমাদের আঙ্গুলের ছাপও নিখুঁতভাবে পুনরায় তৈরি করতে সক্ষম।

পৃথক পৃথকভাবে মানুষের ব্যক্তি পরিচয় নির্ধারণের কুরআন কেন বিশেষভাবে আঙ্গুলের ছাপে কথা বলেছে? ১৮৮০সালে স্যার ফ্র্যান্সিস গৌল্ট-এর গবেষণায় ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরিচয় নির্ধারণে আঙ্গুলের ছাপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সারা দুনিয়ায় দু'ব্যক্তি এমনকি অভিন্ন দুই জমজও নেই যাদের আঙ্গুলের ছাপ সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। এ কারণে সমগ্র বিশ্বব্যাপী পুলিশবাহিনী অপরাধীদের শনাক্ত করতে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে।

১৪'শ বছর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলের ছাপের অনন্যতা সম্পর্কে কে জানত? নিশ্চিতভাবে এটা সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানত না!

ত্বকে ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণের উপস্থিতি

ধারণা করা হত যে, অনুভূতি ও ব্যথার উপলব্ধি শুধুমাত্র মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, ত্বকে ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে, যা ছাড়া কোন ব্যক্তি ব্যথা উপলব্ধি করতে পারে না।

আগুনের পোড়ার ফলে ক্ষতে আক্রান্ত কোন রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার একটি সরু পিনের সাহায্যে পোড়ার মাত্রা পরীক্ষা করেন। রোগী ব্যথা অনুভব করলে ডাক্তার খুশি হন, কেননা এতে বোঝে নেন যে অগ্নিক্ষতটি অগভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ অক্ষত রয়েছে। কিন্তু রোগী ব্যথা অনুভব না করলে, বোঝে নেন যে, অগ্নিক্ষতটি গভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ নষ্ট হয়ে গেছে।

আয়াতে কুরআন ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়ঃ

"যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করব, যখন তাদের গায়ের চামড়া দগ্ধ হবে, আমি সেই চামড়াকে নতুন চামড়া দ্বারা বদলে দেব যেন তারা (শাস্তির পর) শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। - আন-নিসা ঃ ৫৬

থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবদেহের গঠনসংক্রান্ত বিজ্ঞান (Anatomy) বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাগাতাত তেজাসের ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণের উপর দীর্ঘদিন ব্যাপী গবেষণা করেছেন। প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যই কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে উল্লেখ করে গেছে। পরবর্তীতে তিনি কুরআনের এই বিশেষ আয়াতটির অনুবাদ পরীক্ষা করেন।

প্রফেসর তেজাসেন কুরআনের আয়াতের বৈজ্ঞানিক যথার্থতায় এত বেশি মুগ্ধ হন যে, রিয়াদে অনুষ্ঠিত কুরআন ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বিষয়ক অষ্টম সৌদি চিকিৎসা সম্মেলনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

"আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

কুরআন ও বৈজ্ঞানিক সত্য

কুরআনে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর উপস্থিতিকে সমকালীনতা হিসেবে অভিহিত করা সাধারণ জ্ঞান ও সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী।

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আয়াতের বৈজ্ঞানিক যথার্থতা কুরআনের উন্মুক্ত ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে।

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ -

আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব দূর দিগন্তে (অর্থাৎ দূর পর্যন্ত ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হবে) আর তাদের নিজেদের মধ্যেও (অর্থাৎ কাফিররা নতজানু হয়ে ইসলাম কবুল করবে) যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য। এটা কী যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সব কিছুরই সাক্ষী। হামীম সিজদাহ ঃ ৫৩

আয়াতটির মাধ্যমে কুরআন সকল মানুষকে এ বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে বলেঃ

"নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে, নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্যে।"

কুরআনের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ এটি যে আল্লাহর ওহী তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। ১৪০০ বছর পূর্বে কোন মানুষের দ্বারা এরূপ নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বলিত বই রচনা সম্ভব ছিল না।

কুরআন অবশ্য বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নয়, বরং নিদর্শন গ্রন্থ। এ নিদর্শনগুলো মানুষকে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ও প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বাস করার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে শেখায়। কুরআন সত্যিকারভাবে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক আল্লাহর বাণী। এতে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী রয়েছে যা আদম, মূছা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সা.) সহ সকল নবী ও রাসূল প্রচার করেছিলেন ও যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দৃঢ়ভাবে সকলকে আহ্বান করেছিলেন।

'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' বিষয়ে বিস্তারিত বহু বৃহৎ গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা চলছে। ইনশাআল্লাহ, এই গবেষণা মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আরও সন্নিকটে আসতে সাহায্য করবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে শুধুমাত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য, আমি বিষয়টিতে পূর্ণ গবেষণা করতে পেরেছি বলে দাবী করি না।

কুরআনে উল্লিখিত একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক নিদর্শনের শক্তির কারণে প্রফেসর তেজাসেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কুরআন যে আসমানী গ্রন্থ তা নিশ্চিত হতে প্রমাণস্বরূপ কারো প্রয়োজন হতে পারে ১০ টি নিদর্শন, আবার কারো ১০০ টি নিদর্শন। আবার কেউ ১০০০ নিদর্শন দেখার পরও সত্য (ইসলাম) গ্রহণ করবেনা। নীচের আয়াতে কুরআন এ ধরণের বদ্ধ মানসিকতার নিন্দা করে ঃ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

"তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।" -বাকারাহঃ ১৮

ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভিত্তিতে আধুনিক মানুষের তৈরি বিভিন্ন মতবাদের চেয়ে কুরআনের জীবনব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত। সৃষ্টিকর্তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল পথনির্দেশনা আর কে প্রদান করতে পারে?

আমি দো'আ করি, আল্লাহ যেন এ সামান্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, আমি তাঁর কাছে ক্ষমা ও হিদায়াত প্রার্থনা করি। (আমীন)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাহি।